কা য় রো ট্রি ল জি

প্যালেস ওয়াক

নাগিব মাহফুজ

অনুবাদ

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

ঐতিহ্য

ভূমিকা

না গি ব মা হ ফু জ
দুই সভ্যতার পুত্র/ধারক

১৯১১ সালের ১১ ডিসেম্বর কায়রোর গামালিয়া মহল্লায় আরবি সাহিত্যে প্রথম এবং একমাত্র নোবেল পুরস্কার বিজয়ের গৌরবের অধিকারী নাগিব মাহফুজের জন্ম। পরিবারে পাঁচ ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। ষষ্ঠ ভাই ছিলেন তাঁর চেয়ে দশ বছরের বড়। অত্যন্ত সুখে কেটেছে তাঁর শৈশব। ধর্ম তাঁর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জীবনের প্রথম দশ বছর তিনি গামালিয়ায় কাটান এবং তাঁর প্রথম দিকের বাস্তবধর্মী উপন্যাস 'মিদাক অ্যালে', 'কায়রো ট্রিলজি', 'চিলড্রেন অব দ্য অ্যালে', 'দ্য হারাফিশ'-এ গামালিয়ার জীবন উঠে এসেছে বিস্তারিতভাবে। মিসরের সমাজকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর রচনায়। পারিবারিক জীবনও তাঁর রচনায় অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে, যা 'কায়রো ট্রিলজি'তে আবদ আল-জাওয়াদ পরিবারের বাড়িকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। মাহফুজ বাড়ির বিভিন্ন কক্ষ এবং ছাদসহ গোপন জায়গার কথা উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন, যে জায়গাগুলো পরিবারের সদস্যদের এবং প্রেমিক-প্রেমিকার মিলিত হওয়ার দৃশ্যপট ছিল। ১৯১৯ সালের বিপ্লবের স্থায়ী প্রভাব ছিল তাঁর ওপর, যখন তাঁর মধ্যে প্রথম জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে, যার প্রভাব দেখা যায় তাঁর রচনায়। ১৯৫২ সালের বিপ্লব তাঁর মাঝে সম্ভবত কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল এবং তাঁর অনেক রচনায় তিনি এর প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অনেক বুদ্ধিজীবীকে নাসের ভিন্নমত প্রকাশের অভিযোগে গ্রেপ্তার করলেও মাহফুজ গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯২০ সালের দিকে তাঁর পরিবার গামালিয়া থেকে নতুন শহরতলি আব্বাসিয়ায় চলে যায় এবং তাঁর বেশ কিছু উপন্যাস ও ছোটগল্পে তিনি তাঁর নতুন পরিবেশ পরিমণ্ডলের কথা তুলে ধরেছেন।

নাগিব মাহফুজের লেখালেখির সূত্রপাত ঘটেছিল তিনি যখন প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র তখন থেকেই, যখন তিনি গোয়েন্দা কাহিনি, ঐতিহাসিক ও রহস্য উপন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার সময় তিনি আরবি সাহিত্যিক তাহা হোসেন, মুহাম্মদ হোসেন হাইকল, ইব্রাহিম আল-মাজিনির উপন্যাসের দিকে ঝোঁকেন, যাঁরা তাঁর ছোটগল্প রচনার আদর্শ ছিলেন। মাহফুজ পড়াশোনার ক্ষেত্রে

গণিত ও বিজ্ঞানের প্রতি মনোযোগী ছিলেন এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য ১৯৩০ সালে ভর্তি হন ফুয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেটি বর্তমানে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত। ১৯৩৪ সালে তিনি দর্শনে ডিগ্রি লাভ করেন এবং আব্বাস আল-আক্কাদের রচনা পাঠ করে দর্শনভিত্তিক লেখায় অনুপ্রাণিত হন। মাধ্যমিক স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সময়ে তাঁর চল্লিশটির অধিক লেখা বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, যার অধিকাংশই ছিল দর্শন ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়কেন্দ্রিক। ১৯৩৪ থেকে ১৯৭১ সালে ষাট বছর বয়সে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন সরকারি বিভাগে কাজ করেছেন সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সেক্রেটারিয়েল পদে নিয়োজিত ছিলেন। এরপর তিনি বদলি হন ধর্ম মন্ত্রণালয়ে, যেখানে তিনি মন্ত্রীর সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি তাঁর জন্মস্থান গামালিয়ার কাছে ঘুরি লাইব্রেরিতে বদলি হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান এবং দরিদ্রদের জন্য একটি সুদমুক্ত ঋণ কর্মসূচি চালু করতে সক্ষম হন। ১৯৫০ সাল থেকে তিনি ন্যাশনাল গাইডেন্স মন্ত্রীর সেক্রেটারি, ফিল্ম সেন্সরশিপ দপ্তরের পরিচালক, ফিল্ম সাপোর্ট অর্গানাইজেশনের মহাপরিচালক, ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির উপদেষ্টা এবং পরবর্তীকালে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত মাহফুজ অবিবাহিত জীবন কাটান। বিয়ে করেন ৪৩ বছর বয়সে। তাঁর দুটি কন্যাসন্তান নিয়ে কায়রোর নীল নদের তীরবর্তী আগোজা এলাকায় একটি বাড়িতে বসবাস করেন। জীবনে মাত্র তিনবার তিনি মিসরের বাইরে গেছেন, একবার ইয়েমেনে, আরেকবার সাবেক যুগোস্লাভিয়ায় এবং একবার ইংল্যান্ডে সার্জারির জন্য।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'খুফুজ উইজডম' প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। এরপর তাঁর আরো ৩৫টি উপন্যাস এবং ১৫টি ছোটগল্পসংগ্রহ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর আত্মজীবনী। ১৯৯৪ সালে তাঁর জীবনের ওপর হামলা হয়। হামলাকারী তাঁর গলায় ছুরিকাঘাত করে এবং অল্পের জন্য তিনি প্রাণে রক্ষা পান। এ ঘটনার পর তিনি সুস্থ হলেও তাঁর লেখার ক্ষমতা দৈনিক মাত্র আধা ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। অবশিষ্ট জীবনে তাঁর পক্ষে মাত্র দুটি সংক্ষিপ্ত উপন্যাস রচনা করা সম্ভব হয়েছিল—'দ্য ড্রিমস' এবং 'ড্রিমস অব ডেপারচার'। এ উপন্যাস দুটি প্রকাশিত হয় ২০০৪ ও ২০০৬ সালে। ১৯৪০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত নাগিব মাহফুজ প্রায় ২৫টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পকে কেন্দ্র করে মিসরে ৩০টির বেশি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। ১৯৭১ সাল থেকে তিনি কায়রোর বিখ্যাত দৈনিক 'আল-আহরাম'-এ প্রতি সপ্তাহে একটি করে নিবন্ধ লিখতেন। নাগিব মাহফুজ তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য দুবার মিসরের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার অর্জন করেন। ১৯৮৮ সালে পান সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার। ১৯৮৯ সালে কায়রোর আমেরিকান ইউনিভার্সিটি তাঁকে প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল প্রদান করে। একই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৫ সালে তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রিতে ভূষিত করে। ১৯৯২ সালে আমেরিকান একাডেমি অ্যান্ড ইনস্টিটিউট অব আর্টস অ্যান্ড লেটারস তাঁকে

অনারারি সদস্য পদ দেয় এবং ২০০২ সালে তিনি আমেরিকান একাডেমি অব আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সে নির্বাচিত হন। ২০০৬ সালের ৩০ আগস্ট তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৯৮৫ সালে 'আমেরিকান ইউনিভার্সিটি ইন কায়রো প্রেস' তাঁর রচনা প্রকাশের জন্য এক চুক্তি স্বাক্ষর করার পর ১৯৮৮ সালে তাঁর নোবেল পুরস্কার লাভ করা পর্যন্ত তাঁর নয়টি উপন্যাস ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে এবং বিশ্বব্যাপী সেগুলো বাজারজাত করার পর বিশ্বব্যাপী তাঁর সাহিত্যকর্ম জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পাশাপাশি অন্যান্য ভাষায়ও তাঁর উপন্যাস অনূদিত হতে শুরু করে। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর তিনি লেখেন, 'আমার বিশ্বাস, ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষায় উপন্যাসগুলো প্রকাশিত হওয়ার কারণেই আমার পক্ষে নোবেল পুরস্কার লাভ করা সম্ভব হয়েছে।' অবশ্য ইংরেজিতে তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস ছিল 'মিরামার', যেটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। বর্তমানে ৪০টি ভাষায় তাঁর উপন্যাসগুলোর প্রায় ৬০০ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে নাগিব মাহফুজের ৮৫তম জন্মদিন এবং তাঁর 'Echoes of an Autobiography' আরবি গ্রন্থের প্রকাশনা উপলক্ষে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি ইন কায়রো প্রেস সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে 'নাগিব মাহফুজ মেডেল ফর লিটারেচার'-এর উদ্বোধন করে। প্রতিবছর তাঁর জন্মদিনে এ পদক প্রদান করা হয়। ২০০১ সালের ১১ ডিসেম্বর নাগিব মাহফুজের ৯০তম জন্মদিন ও ২০ খণ্ডে 'The Complete Mahfouz Library'-র প্রকাশনা উপলক্ষে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি ইন কায়রো প্রেস 'নাগিব মাহফুজ ফান্ড ফর ট্রান্সলেশনস অব অ্যারাবিক লিটারেচার' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়, যার উদ্দেশ্য সেরা আরবি উপন্যাস অনুবাদ ও বিশ্বব্যাপী তা বিতরণ করা। ২০০৬ সালে প্রথম বার্ষিক নাগিব মাহফুজ মেমোরিয়াল লেকচার দেন সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী নাদিন গর্ডিমার। আমেরিকান ইউনিভার্সিটি ইন কায়রো প্রেস বর্তমানে মাহফুজের সাহিত্যকর্ম ৪৩ খণ্ডে প্রকাশ করেছে।

নাগিব মাহফুজের অধিকাংশ উপন্যাসের ক্ষেত্র কায়রো। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কিছু গ্রন্থে ধারাবাহিকভাবে মিসরের সমগ্র ইতিহাসকে তুলে ধরা। কিন্তু তিনটি ঐতিহাসিক উপন্যাস 'আবাথ আল-আকদার' *(Mockery of the Fates)* (1939), 'রাডোপিস' (1943), এবং 'কিফাহ তিবাহ' *(The Struggle of Thebes)* (1944) রচনার পর তিনি তাঁর পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে সাধারণ মিসরবাসীর সামাজিক পরিবর্তনের বর্তমান ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের ওপর তাঁর মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। তিনি তাঁর রচনায় সমাজতন্ত্র, সমকাম ও ঈশ্বর সম্পর্কে নিজস্ব ধ্যানধারণা অকপটে প্রকাশ করেছেন। এসব বিষয়ের কোনো কোনোটি সম্পর্কে লেখা মিসরে নিষিদ্ধ ছিল। তাঁর প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম হিসেবে বিবেচিত হয় পঞ্চাশের দশকে তাঁর রচিত 'কায়রো ট্রিলজি', যেটি তিনি শেষ করেন জুলাই বিপ্লবের আগে। তিন খণ্ডের এই উপন্যাস তিনটি রাস্তার নামে—'বায়ান আল-কাসরায়েন' বা 'প্যালেস ওয়াক' (১৯৫৬), 'কসর আল-শউক' বা 'প্যালেস অব ডিজায়ার' (১৯৫৬) এবং 'আল-সুক্কারিয়া' বা 'সুগার স্ট্রিট' (১৯৫৭)। কায়রোর যে এলাকায় মাহফুজ বেড়ে উঠেছিলেন, উপন্যাসটি

সেখানে এক পিতৃতান্ত্রিক পরিবারকেন্দ্রিক। সে পরিবারের প্রধান আল-সাইয়িদ আহমদ আবদ আল-জাওয়াদ এবং তার পরিবারের তিনটি প্রজন্ম উঠে এসেছে উপন্যাসটিতে এবং সময়কাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে ১৯৫০-এর দশকে রাজা ফারুককে উৎখাত করা পর্যন্ত। 'কায়রো ট্রিলজি' লেখা শেষ করার পর মাহফুজ বেশ কিছুদিন পর্যন্ত তাঁর লেখার কাজ বন্ধ রেখেছিলেন। ১৯৫২ সালে গামাল নাসের কর্তৃক রাজতন্ত্রের অবসান ঘটানোর পর উদ্ভূত পরিস্থিতি তাঁকে হতাশ করেছিল। ১৯৫৯ সাল থেকে তিনি আবার পুরোদমে লিখতে শুরু করেন। পরে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'নাসের আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম সেরা একজন রাজনৈতিক নেতা। তিনি সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করার পরই আমি তার প্রশংসা করতে শুরু করি।'

১৯৬৬ সালে প্রকাশিত তাঁর অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাস 'হারথারা ফাউক আল-নিল' *(Adrift on the Nile)*. পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের সময় এটির ওপর ভিত্তি করে একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। উপন্যাসের কাহিনিতে নাসেরের শাসনামলে মিসরীয় সমাজের অবক্ষয়ের কঠোর সমালোচনা ছিল। তখনো মিসরে সাবেক প্রেসিডেন্ট নাসেরের অসংখ্য অনুরাগী ছিল এবং মাহফুজের উপন্যাস তাদের ক্ষুব্ধ করতে পারে আশঙ্কায় সাদাতের সময়ে গ্রন্থটি নিষিদ্ধ করা হয়। নব্বইয়ের দশকের শেষাবধি পর্যন্ত উপন্যাসটির কোনো কপি পাওয়া কঠিন ছিল। ষাটের দশকে নাগিব তাঁর অস্তিত্ববাদী প্রতিপাদ্যভিত্তিক উপন্যাসগুলোতে ঈশ্বরের দিক থেকে দৃশ্যত সরে আসেন এবং মানবতাবাদের আদর্শ মূর্ত হয়ে ওঠে তাঁর রচনায়। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস 'দ্য থিফ অ্যান্ড দ্য ডগ'-এ তিনি এক মার্ক্সবাদী চোরের ভাগ্য তুলে ধরেন, যে কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর প্রতিশোধ গ্রহণের পরিকল্পনা আঁটে। ষাট ও সত্তরের দশকে মাহফুজ উপন্যাসে আত্মকথনের পদ্ধতি অবলম্বন করেন। 'মিরামার' উপন্যাসের চারটি চরিত্র প্রথম পুরুষে বর্ণনা দিয়ে যায়, তাদের মধ্যে একজন ছিল সমাজতন্ত্রী, আরেকজন নাসেরপন্থী সুবিধাবাদী, যথার্থই ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিনিধি। কাহিনির কেন্দ্রে রয়েছে এক সুন্দরী, আকর্ষণীয় চাকরানি। 'অ্যারাবিয়ান নাইটস অ্যান্ড ডেজ' (১৯৮১) এবং 'দ্য জার্নি অব ইবন ফাতুমা' (১৯৮৩) উপন্যাসে প্রচলিত আরব বিবরণীর পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। 'আখেনাতুন : ডুয়েলার ইন ট্রুথ' (১৯৮৫) মূলত পুরোনো ও নতুন ধর্মীয় সত্যসম্পর্কিত উপন্যাস।

নাগিব মাহফুজের অধিকাংশ রচনায় রাজনৈতিক বিষয় অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন, 'আমার সব লেখায় আপনারা রাজনীতি দেখতে পাবেন। কোনো কোনো কাহিনিতে দেখবেন প্রেম অথবা অন্য কোনো বিষয়কে অগ্রাহ্য করা হয়েছে, কিন্তু রাজনীতিকে নয়। কারণ, রাজনীতিই আমাদের চিন্তাভাবনার অনেকখানি জুড়ে থাকে। মিসরীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব অনেক উপন্যাসে উঠে এসেছে এবং বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের ওয়াফদ পার্টির প্রতি তিনি খোলামেলা তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। যৌবনে তিনি সমাজতন্ত্রী এবং

গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তাঁর প্রথম দুটি উপন্যাস 'আল খালিলি' ও 'নিউ কায়রো' এবং পরবর্তী সময়ের অনেক রচনায় তাঁর ওপর সমাজতন্ত্রের প্রভাব অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর অনুরাগের পাশাপাশি 'ইখওয়ানুল মুসলেমিন' বা মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতি তাঁর বিরাগ চাপা থাকেনি। তাঁর উপন্যাস ও অন্যান্য লেখায় মৌলবাদী ইসলামের সমালোচনা করেছেন তিনি এবং সমাজতন্ত্রের গুণাবলি ও মৌলবাদী ইসলামের নেতিবাচক দিকের ওপর আলোকপাত করেছেন। নাগিব মাহফুজ মুসলিম ব্রাদারহুডের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবক্তা সাইয়িদ কুতুবকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে কুতুব তাঁর সমালোচনায় মাহফুজের সাহিত্য-প্রতিভার স্বীকৃতি দেন। ষাটের দশকে সাইয়িদ কুতুবের জীবনের শেষ দিকে মাহফুজ তাঁকে হাসপাতালে দেখতেও গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর আধা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'মিররস'-এ সাইয়িদ কুতুবের অত্যন্ত নেতিবাচক চিত্র এঁকেছেন।

নাগিব মাহফুজ তাঁর কাজের জন্য কখনোই বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। ১৯৭৮ সালে ইসরায়েলের সাথে আনোয়ার সাদাত ক্যাম্প ডেভিড শান্তিচুক্তিতে উপনীত হলে মাহফুজ প্রকাশ্যে চুক্তির সমর্থনে অবতীর্ণ হন এবং এর পরিণতিতে অনেক আরব দেশে তাঁর বই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তাঁর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল। সালমান রুশদির 'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস' প্রকাশিত হওয়ার পর আয়াতুল্লাহ খোমেনি ১৯৮৯ সালে তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলে খোমেনির ফতোয়ার নিন্দা করেন। একই সাথে তিনি 'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস'-এ ইসলামের অবমাননা করা হয়েছে বলেও সমালোচনা করেন। মাহফুজ মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হলেও রুশদির কাজের সাথে ব্যক্তিগতভাবে একমত হতে পারেননি। কিন্তু এ কারণে তাঁকে হত্যা করার ফতোয়া জারি করার পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। এ জন্য তিনি খোমেনিকে একজন সন্ত্রাসী হিসেবে বর্ণনা করেন।

১৯৯৮ সালে নোবেল পুরস্কার লাভের পর তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, 'আমি দুটি সভ্যতার পুত্র, যখন ইতিহাসের নির্দিষ্ট একটি যুগের আনন্দময় মিলন ঘটেছে। এর প্রথমটি সাত হাজার বছরের প্রাচীন "ফারাও সভ্যতা, আর দ্বিতীয়টি এক হাজার চার শো বছরের পুরোনো ইসলামি সভ্যতা।"' আরবি সাহিত্যের শিকড় অনুসন্ধান করলে দুই হাজার বছরের প্রাচীনত্ব খুব সহজে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়, যখন আরবি কবিতার বিকাশের বিস্তৃতি ছিল তখনকার আরবীয় সমাজের সর্বত্র এবং এর চর্চা ছিল মানুষের মুখে মুখে, যার রূপ ছিল প্রধানত বিবরণমূলক। 'আরব্য উপন্যাস', যা আরব জগতে 'সহস্র এক রজনী' নামে কালোত্তীর্ণ বিশ্বজনীন জনপ্রিয়তা লাভ করে, যার মূল উৎসভূমি ছিল ইরাক, ইরান ও ভারত, তা মিসরে আধুনিক ও চূড়ান্ত রূপ লাভ করে বলে বিশ্বাস করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মিসরের সাহিত্যেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিবরণমূলক দিকটিই প্রাধান্য পেয়েছে, নাগিব মাহফুজকে সে ধারার সফল ধারক হিসেবে অনেকে মনে করেন।

আরবি সাহিত্যের প্রাচীনত্ব সত্ত্বেও পাঁচটি পূর্বশর্ত পূরণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মিসরে উপন্যাসের সূচনা হয়নি। এই পূর্বশর্তগুলো হচ্ছে : ১. ইয়োরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব, যেখানে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে উপন্যাস সাহিত্যের প্রধান আঙ্গিক হিসেবে বিকশিত হয়েছিল, ২. ঊনবিংশ শতাব্দীতে মিসরে সংবাদপত্রের প্রকাশনার পাশাপাশি প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠা, ৩. সরকারি উদ্যোগে শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তার, ৪. পর্যায়ক্রমে বিদেশি ঔপনিবেশিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তির চেষ্টা ও ১৮০০ সালের গোড়ার দিকে নেপোলিয়নের শাসন-পরবর্তী সময়ে মুহাম্মদ আলির নেতৃত্বে মিসরীয়দের শক্তিবৃদ্ধির সূত্রপাত এবং ৫. আন্তর্জাতিক শিক্ষায় শিক্ষিত বৃদ্ধিজীবী শ্রেণির অভ্যুদয়।

এভাবে শেষ পর্যন্ত আরবি সাহিত্যের পুনর্জাগরণ সূচিত হলেও তা অতীতের বৈশিষ্ট্য ও ধারাকে ধারণ করেই বর্তমান বাস্তবতার নিরিখে ভবিষ্যতের সোপান বেয়ে এগিয়ে চলেছে। আরবি সাহিত্যের সমালোচনা ও ইতিহাস বর্ণনায় ব্যবহৃত শব্দ 'নাহদাহ' বলতে প্রকৃতপক্ষে 'জেগে ওঠা' অথবা নবজীবনের উন্মেষ ঘটানোর ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট, একাদশ শতাব্দী থেকে সাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহ্যের যে অবক্ষয় বা বন্ধ্যাত্ব চলছিল, তা থেকে বেরিয়ে আসার প্রবল একটি উদ্যোগ ছিল। এ ধারণাটি সৃজনশীলতা, নতুন বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ, আধুনিকতা, গতিশীলতা ও অগ্রগতির পরীক্ষার সাথেও নিবিড়ভাবে জড়িত। এভাবে মিসরীয় উপন্যাস বিংশ শতাব্দীর বেশ কিছু খ্যাতিমান লেখকের গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে পরিপক্বতা লাভ করে, যাদের অন্যতম মুহাম্মদ হুসাইন হেইকল (১৮৮৮-১৯৫৬), তাহা হুসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩), ইব্রাহিম আল-মাজিনি (১৮৯০-১৯৪৯), মাহমুদ তাহির লাশিন (১৮৯৪-১৯৫৪) এবং তাউফি আল-হাকিম (১৮৯৮-১৯৮৭)। মুহাম্মদ হুসাইন হেইকলের উপন্যাস 'জয়নাব' প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালে এবং এ উপন্যাসটিকে প্রথম সফল আধুনিক আরবি উপন্যাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যদিও তাঁর আগে আরো বেশ কজন সাহিত্যিক বেশ কিছু উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার সময়েই জন্মগ্রহণ করেন তাঁর সফল উত্তরাধিকারী নাগিব মাহফুজ, যিনি পরবর্তী অর্ধশতাব্দীতে আরবি উপন্যাসের ধারাকে আধুনিকতার শীর্ষে উন্নীত করতে অবদান রাখেন এবং এ স্বীকৃতি লাভ করেন ১৯৮৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভের মধ্য দিয়ে।

বহু মিসরীয় নাগিব মাহফুজের সাহিত্যকর্মের সাথে পরিচিত ছিল তাঁর কাহিনিকে কেন্দ্র করে তৈরি সিনেমার মাধ্যমে। তাঁর উপন্যাসে মিসরীয় ইতিহাস, সমাজ, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রকাশ, প্রতিফলন ও সৃজনশীলতার গুণে অন্য সাহিত্যিকেরা তাঁর ধারা অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং নাগিব মাহফুজ আধুনিক আরবি সাহিত্যে আধুনিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ ও দৃষ্টান্তে পরিণত হন। পাশাপাশি মিসরের চলচ্চিত্র বিকশিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের পরই বিশ্বে সেরা প্রস্তুতকারী দেশ হিসেবে যে খ্যাতির স্থান করে নেয়, সে ক্ষেত্রেও নাগিব মাহফুজের অবদান প্রায় একক। তাঁর রচনার গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে মিডিয়ার ভূমিকাও ছিল অনন্য;

কারণ, মিসরের প্রাচীনতম দৈনিক সংবাদপত্র 'আল-আহরাম'সহ সকল জনপ্রিয় ম্যাগাজিন ও দৈনিকে নিয়মিত তাঁর রচনা ও তাঁর-সম্পর্কিত আলোচনা প্রকাশিত হতো গুরুত্বের সাথে।

১৯৮২ সালে প্রকাশিত নাগিব মাহফুজের উপন্যাস 'লাইলি আলফ লায়লা', যেটি ইংরেজিতে 'অ্যারাবিয়ান নাইটস অ্যান্ড ডেজ' নামে অনূদিত হয়েছে, সেটিতে 'আরব্য উপন্যাস'-এর কাহিনি বলার ঢঙে সমসাময়িক রাজনীতি ও সমাজকে তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে সমাবেশ ঘটেছে বহু ধরনের চরিত্রের—শাসক, শাসিত, ভবিষ্যদ্বাণী করার আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী ব্যক্তি, গোপন যোগসূত্র এবং ভালো ও মন্দ, শুভ ও অশুভ, সঠিক ও ভুল, সত্য ও প্রতারণা—যা সর্বজনীনতার গুণে সমৃদ্ধ। এসব কাহিনি স্বপ্নের কথা বলে এবং সদাচরণের শিক্ষা দেয়। যদিও কোনো বিচারেই নাগিব মাহফুজ কোনো নীতির প্রচারক হিসেবে নিজেকে বিবেচিত হতে দেননি, কিন্তু তাঁর একটি লক্ষ্য ছিল, লেখক হিসেবে সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন। তাঁর সৃষ্টি সংস্কৃতি, শালীনতা ও সদাচারের শিক্ষা দেয়, বিশেষত তিনি যখন কায়রোর নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিবারকে তাঁর কাহিনিতে তুলে এনেছেন, যাদের মাঝে তিনি তাঁর শৈশব ও যৌবন কাটিয়েছেন। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্প বাস্তবে শিল্পকর্ম, যেখানে অতি প্রাচীনকাল থেকে সমসাময়িক প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, মানুষের প্রশ্ন ও সমস্যা, সমাজের দার্শনিক দিক ও অস্তিত্বের সংগ্রামের বিষয় এসেছে, মিসরের ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্ন, মানুষের দুর্নীতিচিন্তা ও অনিবার্য বিপর্যয় ফুটিয়ে তুলতে নাগিব মাহফুজ একজন তদন্তকারীর ভূমিকা পালন করেছেন অব্যাহতভাবে এবং এসবের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকেই সন্ধান করেছেন। তাঁর উপন্যাসের পাঠকদের সাথে বিচিত্র চরিত্রের মানুষের সাক্ষাৎ ঘটে, তাঁর বর্ণনার মানুষগুলো সামনে আসে, আবার নিমেষেই হারিয়ে যায়, কিন্তু পাঠকের মনে স্থায়ী প্রভাব ফেলে যায়, অনেক প্রশ্ন রেখে যায় পাঠকের মনে অথবা হেঁয়ালির সৃষ্টি করে। তাঁর উপন্যাস পাঠককে প্রায়শ ধারণা দেয় যে তিনি প্রকৃতপক্ষে মিসরের ইতিহাস রচনা করেছেন, শুধু সময় ও পরিবেশের সাথে প্রেক্ষাপট বদলে গেছে এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে কোথাও কোথাও অর্থ ও ব্যাখ্যা বদলে গেছে মাত্র।

লেখক হিসেবে নাগিব মাহফুজ জীবন শুরু করেন মিসরের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর জন্মভূমির পরিচিতি এবং সময়ের বিপুল ব্যবধান সত্ত্বেও প্রাচীনত্বের প্রেক্ষাপটে আত্মোপলব্ধি করতে ও নিজের পরিমণ্ডল সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করেছেন। মিসরের যুদ্ধ, সংগ্রাম ও বিপর্যয়ের বছরগুলোতেও তিনি তাঁর দেশের দূর অতীত ইতিহাসের সাথে একটি নির্ভরযোগ্য অবস্থানের সন্ধান করে কাটিয়েছেন। আরবি ভাষার একজন লেখক হয়েও তিনি আরব ও মুসলিম ঐতিহ্যের ঊর্ধ্বে উঠে একজন মিসরীয় হিসেবে তাঁর স্বকীয়তা ও

পরিচিতিকেই প্রধান করে তোলার চেষ্টা করেছেন তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে। তাঁর প্রথম গ্রন্থ **'মিছর** আল কাদিমাহ' (এনশিয়েন্ট ইজিপ্ট, অনুবাদ : জেমস বেইকি) প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৩৯-৪৫ সালে প্রকাশিত তাঁর তিনটি উপন্যাসই ছিল মিসরের প্রাচীন ইতিহাসের ওপর, যার প্রথমটির নাম 'আবাথ আল-আকদার' (আইরনিজ অব ফেট)। উপন্যাসটির মূল নাম ছিল 'হিকমাত খুফু' (দ্য উইজডম অব খুফু)। ফারাও খুফু মিসরের প্রাচীন রাজবংশের চতুর্থ প্রজন্মের শাসক, যিনি ২৬৮০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে জীবিত ছিলেন। একজন জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না, বরং **'রা'** মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের পুত্র দেদেফের হাতে চলে যাবে রাজক্ষমতা। ফারাও খুফু ভাগ্যের এ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও নিয়তি তার হাত থেকে নিস্তার পায়নি। ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস রচনার কাজে হাত দিয়ে নাগিব মাহফুজ চল্লিশটি উপন্যাস রচনার এক বিশাল পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তিনি দেখতে পান যে অতীত ঘেঁটেও তিনি আসলে বর্তমান সম্পর্কেই লিখছেন। এরপর তিনি আধুনিক মিসরীয়দের জীবনের দিকে ফেরেন, প্রথমে কায়রোতে, তিনি যেখানে তাঁর প্রাথমিক জীবন কাটিয়েছেন, সেখানকার সমাজ ও পরিবার নিয়ে। পরে তিনি আবার দেখতে পান যে বর্তমান নিয়ে লিখতেও অতীত উঠে আসছে তাঁর উপন্যাসে। অতএব, তাঁর সূচনাকালের রচনা ও চল্লিশ বছর পর উনিশ শো আশির দশকের উপন্যাসগুলোতে প্রাচীন মিসরের পটভূমি ফিরে আসা কাকতালীয় কোনো ঘটনা ছিল না। তাঁর সকল রচনার কাঠামোতে মিসরের ইতিহাস অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত উঠে এসেছে।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, নাগিব মাহফুজ যখন সামাজিক ও সমসাময়িক বিষয়গুলোর দিকে গুরুত্ব দিয়েছেন, তখন তাঁর প্রথম জীবনের বিশ্বাসগুলো—যেমন ভাগ্য, অদৃষ্ট, অদৃশ্যের হস্তক্ষেপের দিকগুলোও উল্লেখযোগ্যভাবে স্থান পেয়েছে তাঁর উপন্যাসে। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে প্রায়শ বাতাসে নলখাগড়ার কাঁপুনির এক উদ্ভূত পরিস্থিতির মুখে অসহায় দেখা যায়। তাঁর দ্বিতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাদুবিস' প্রাচীন মিসরের একজন রক্ষিতার কাহিনি, উপন্যাসের নামও তার নামেই। রাদুবিশ ফারাও দ্বিতীয় মেরেনরের প্রেমিকা ও রক্ষিতা ছিলেন এবং কাহিনিটি উভয়ের প্রেম নিয়ে। ফারাও মেরেনরের সম্পর্কে শুধু এটুকু জানা যায় যে তিনি ষষ্ঠ রাজবংশের সময়ে মিসরের শাসক ছিলেন মাত্র এক বছরের জন্য এবং তার সময়ে রানি নিটেক্রিস সুন্দরীশ্রেষ্ঠা হিসেবে খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। ঐতিহাসিক উপাদানের ঘাটতি থাকায় নাগিব মাহফুজ 'রাদুবিস' রচনায় কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন বেশি, যে কারণে তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস 'হিকমাত খুফু' (দ্য উইজডম অব খুফু) থেকে এটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। হিকসস যুদ্ধ সম্পর্কে লিখতে তিনি ১৯৪৪ সালে লেখেন 'কিফাহ তিবাহ' (দ্য স্ট্রাগল অব থেবস) উপন্যাসে মিসরের ওপর একটি বিদেশি শক্তির দীর্ঘ শাসনকালকে তুলে ধরেন। হিকসসদের শেষ পর্যন্ত মিসর থেকে উৎখাতের পর মিসর স্বাধীনতা লাভ করে এবং নতুন ও সমৃদ্ধ মিসর গড়ে উঠতে

থাকে। নাগিব মাহফুজ এভাবে একটি পুনর্জাগরণ, মিসরের জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং তাঁর সময়ের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। প্রাচীন ইতিহাসনির্ভর উপন্যাসগুলোর পর তিনি তাঁর নিজ নগরী কায়রোর দিকে মনোনিবেশ করেন। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হয় 'খান আল-খলিলি', এটি পাঠ করে পাঠকের মনে হতে পারে যে লেখক সহসা তাঁর নিজ যুগে পা দিয়েছেন, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। এ উপন্যাসে একটি পরিবারের জীবন ও বিপর্যয় বর্ণিত হয়েছে, যে পরিবারটি যুদ্ধের সময় নগরীর তুলনামূলক কম অভিজাত এলাকায় চলে যেতে বাধ্য হয়, যেখানে লেখক নিজেও এর একটি অংশ। মাহফুজের অনেক উপন্যাসে নারী চরিত্রগুলোর ভূমিকা মুখ্য। অনেক ক্ষেত্রে বেশ্যা ও অধঃপতিত অন্যান্য নারীর অবস্থান শক্তিশালী এবং বুদ্ধিবৃত্তিতেও সেরা। পুরুষশাসিত বিশৃঙ্খল জীবনে নারীদের তিনি মর্যাদার স্থান দিয়েছেন। নিপীড়িত ও দুর্দশাগ্রস্তদের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ব প্রদর্শন করেছেন। এ বিষয়গুলোকে তিনি জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন 'জুকাক আল মিদাক্ক' (মিদাক অ্যালে-১৯৪৭), পরবর্তী উপন্যাস 'আল-সারাব' (দ্য মিরেজ-১৯৪৮)-এ তিনি মাতৃত্বের প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন নিপুণভাবে। এই উপন্যাসটিই নাগিব মাহফুজকে 'আল-থুলাথিয়া' বা 'কায়রো ট্রিলজি' (১৯৫৬-১৯৫৭) রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। 'আল-সারাব' একটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, যাতে ভাগ্য, নিয়তি, আকাঙ্ক্ষার বিষয়গুলো বহুভাবে তুলে আনা হয়েছে এবং সেগুলোর কোনো উত্তর বা সমাধান নেই। লজ্জার অনেক বিষয় আছে, কিন্তু অপরাধবোধ নেই। এক নারী তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর পুত্রকে নিয়ে চলে আসেন এবং ভালোবাসায় আগলে তাকে গড়ে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি করেন না। ছেলেটি স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়—কোথাও ভালো ফলাফল করতে পারে না, কোনোমতে একটি সরকারি চাকরি লাভ করে। বিয়ে করলেও স্ত্রীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারে না। স্ত্রী অবিশ্বস্ত, পরকীয়ায় লিপ্ত, যার মৃত্যু ঘটে গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে। ছেলেটি শেষ পর্যন্ত মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠার সাহস করে, মায়ের সাথে প্রথমবারের মতো বিবাদে লিপ্ত হয় এবং মা পুত্রের দ্বারা লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করেন।

নাগিব মাহফুজের বাস্তবভিত্তিক উপন্যাস 'কায়রো ট্রিলজি' তাঁকে বিশ্বখ্যাতি এনে দেয় এবং তিনি নোবেল পুরস্কার অর্জনের গৌরব অর্জন করেন। বিশাল এ উপন্যাসটির একই কাহিনিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। 'বায়ান আল-কাসরায়েন' (প্যালেস ওয়াক-১৯৫৬), 'কসর আল শউক' (প্যালেস অব ডিজায়ার-১৯৫৭) ও 'আল-সুক্কারিয়া' (সুগার স্ট্রিট-১৯৫৭)। তাঁর আরেকটি উপন্যাস 'আওলাদ হারাতিনা', যার ইংরেজি অনুবাদ 'চিলড্রেন অব গ্যাবেলাউয়ি' নামে প্রকাশিত হয় এবং নাগিব মাহফুজের জীবনের গতি প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হয় তাঁর এ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর। ধনবান ও ক্ষমতাধর গ্যাবেলাউয়ি যখন তার সন্তানদের বাড়ি থেকে বের করে দেন, যেন তাদের স্বর্গ থেকে বহিষ্কার করা হলো। গ্রন্থটির জটিল বর্ণনারীতিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে কীভাবে পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা সন্তানদের

ভাগ্য নির্ধারণ করে, যেখানে ব্যাখ্যাতীত মূল চরিত্র দৃশ্যপটের বাইরে এবং নিজেকে যে বাড়িতে গুটিয়ে নিয়েছেন, তা শুধু দূর থেকে দেখা যায়। নাগিব মাহফুজ তাঁর উপন্যাসে এক অর্থে সৃষ্টির সূচনা থেকে ১৯৫০-এর দশক পর্যন্ত মানুষের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। একই সাথে এটি কায়রোর শহরতলির শিশুরা যে কী যাতনার মধ্যে কাটায়, তা-ও উঠে এসেছে। তার বিবরণে কোরআনের বাণী, রাসুলের হাদিসের উদ্ধৃতি আছে। উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলোকে ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। গ্যাবেলাউয়ি স্বয়ং আল্লাহর প্রতিভূ, সর্বশক্তিমান। অনুরূপ অন্য মূল চরিত্রগুলো, যেমন ইদ্রিস, আদহাম, জাবাল, রিফাআ, কাসিম ও আরাফা প্রতিনিধিত্ব করেছে শয়তান, মুসা, যিশু ও মুহাম্মদ (সা.) এবং আধুনিক বিজ্ঞানকে। কিন্তু কাহিনির কাঠামো ও পরিবেশ কায়রোর উপকণ্ঠে মুকাত্তাম পর্বতের পাদদেশে ছোট্ট শহরের ততোধিক ছোট্ট মহল্লার পারিবারিক কলহ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সেবাযত্নকেন্দ্রিক। পরিবারের কিছু সদস্য স্থানীয় প্রধানকে ভয় পায় অথবা অনুসরণ করে। অন্যদিকে অনেকে উন্নত আদর্শ আঁকড়ে থাকে। 'আওলাদ হারাতিনা' যখন ১৯৫৯ সালে কায়রোর বিখ্যাত দৈনিক 'আল-আহরাম'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, তখন আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ববিদ ও ইসলামি নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদে সোচ্চার হন এবং উপন্যাসটিকে ধর্মবিদ্বেষী বর্ণনা করে এটি নিষিদ্ধ করার দাবি জানান। জনগণও বিক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু সরকার উপন্যাসটি নিষিদ্ধ করেনি এবং 'আল-আহরাম'-এও ধারাবাহিক প্রকাশনা বন্ধ হয়নি। কিন্তু গ্রন্থাকারে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় বিদেশে। পরে মিসর থেকেও এটি প্রকাশিত হয়। অবশ্য ১৯৮৮ সালে সালমান রুশদির 'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস' প্রকাশিত হওয়ার পর বিশ্বজুড়ে যে বিতর্ক ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়, তাতে নাগিব মাহফুজের 'আওলাদ হারাতিনা' আবার আলোচনায় আসে এবং তাঁকেও সালমান রুশদির কাতারে এনে নতুন করে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ শুরু হয়। যদিও দুই লেখকের মধ্যে সাধারণভাবে কোনো সামঞ্জস্য বা মিল ছিল না। কিন্তু মানবতার পবিত্র অধিকার বিবেচনা করে তিনি সালমান রুশদি ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেন : 'সালমান রুশদিকে হত্যা করার জন্য খোমেনি যে ফতোয়া জারি করেছেন, তা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের লঙ্ঘন ও ইসলামের ওপর আঘাত বলে এ ফতোয়ার তীব্র নিন্দা করছি। আমি বিশ্বাস করি যে খোমেনি ইসলাম ও মুসলমানদের যে ক্ষতি করেছেন, তা লেখকের দ্বারা সাধিত ক্ষতির চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হচ্ছে, এ স্বাধীনতাকে অবশ্যই পবিত্র বলে বিবেচনা করতে হবে এবং আমি মনে করি যে কোনো চিন্তাভাবনাকে পাল্টা চিন্তাভাবনা দ্বারাই সংশোধন করা সম্ভব। আমি গ্রন্থটির ওপর নিষেধাজ্ঞা সমর্থন করেছি সামাজিক শান্তি বজায় রাখার উপায় হিসেবে। কিন্তু এটিকে যাতে চিন্তার পথ রুদ্ধ করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা না হয়।' কিন্তু তাতেও তাঁর ওপর কিছু মানুষের ক্ষোভের উপশম ঘটেনি। তাঁকে সরকারি নিরাপত্তার প্রস্তাব দেওয়া হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৯৪ সালের অক্টোবর মাসে তাঁর

জীবনের ওপর হামলা হয়। দুর্বৃত্তরা তাঁর গলায় ছুরিকাঘাত করলে তিনি গুরুতর আহত হন।

লেখক হিসেবে নাগিব মাহফুজের চিন্তার রাজ্যে উল্লেখযোগ্য স্থানজুড়ে ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ক্রমবিবর্তন, কিন্তু সব সময় তাঁর মূল প্রশ্ন ছিল : ফারাও থেকে শুরু করে সুলতান, খেদিভ, বাদশাহ, প্রেসিডেন্ট, পিতা, দখলদারসহ মিসরের নেতারা তাঁর দেশটির জন্য কী করেছেন। তিনি মিসরের অতীত ও বর্তমান রাজনীতির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন এবং ভুলের পুনরাবৃত্তির বিষয়গুলো এমনভাবে তুলে ধরেছেন যে মিসরের অবক্ষয় ও পতন একটি চিরন্তন ব্যাপার। ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'আমাম আল-আরশ' (সিংহাসনের সামনে) গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন যে মিসরের বিভিন্ন যুগের নেতারা এক দরবারে বিচারের সম্মুখীন। সর্বোচ্চ এই দরবারের বিচারক সূর্য দেবতা ওসিরিস সিংহাসনে আসীন। দেবী আইসিস ও তাদের পুত্র হোরাস ওসিরিসকে সহায়তা করছেন তার পাশে আসন নিয়ে। মিসরের জনক মেনেস, অর্থাৎ ফারাও নারমার, যিনি পাঁচ হাজার বছর আগে ঐক্যবদ্ধ মিসর শাসন করতেন, তিনি থেকে অটোমান শাসক ও ১৯৮১ সালে নিহত আনোয়ার সাদাত পর্যন্ত সকল শাসকের বিচার করতে যাচ্ছেন ওসিরিস। ভিড়ে ভারাক্রান্ত দরবারে যুক্তিতর্ক, অভিযোগ, উত্তপ্ত বিতর্ক চলছে। শেষ পর্যন্ত তিনি বিপ্লবী গামাল আবদ-আল নাসেরের প্রশংসা করার সুযোগ নেন। ১৯৫২ সালে রাজা ফারুককে উৎখাত এবং ১৯৫৩ সালে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত করার পর নাসের ১৯৫৬ সালে ক্ষমতা দখল করেন, যখন মিসরকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বিচারে সূর্য দেবতা ওসিরিস ঘোষণা করেন যে প্রেসিডেন্ট নাসেরই প্রথম শাসক, যিনি মিসরবাসীর প্রতি যত্নবান। কিন্তু ফারাও দ্বিতীয় রামেসেস নাসেরকে দোষারোপ করেন মিসরকে একটি গুরুত্বহীন রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য। অন্যদিকে মিসরের প্রতিষ্ঠাতা ফারাও মেনেস নাসেরকে অভিযুক্ত করেন তিনি মিসরকে আরব জাতীয়তাবাদের মধ্যে বিলুপ্ত করে ফেলেছেন বলে। নাসের তাঁর উত্তরাধিকারী আনোয়ার সাদাতকে দোষারোপ করেন 'ওপেন ডোর পলিসি' গ্রহণের জন্য, যার ফলে মিসরের জন্য পুঁজিবাদের পথ খুলে গেছে, মিসরে আমেরিকার প্রভাব ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। সাদাত অত্যন্ত সফলতার সাথে নিজের অবস্থানের যৌক্তিকতা তুলে ধরলেও নাসেরের যুক্তিও খণ্ডন করার মতো ছিল না। এ পরিস্থিতিতে সাদাত প্রায় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই বিখ্যাত ফারাওদের মধ্যে অত্যন্ত বিতর্কিত আখেনাতেনের সমর্থন লাভ করেন, যিনি ফারাও চতুর্থ আমেনোফিস নামে পরিচিত। দ্বিতীয় রামেসেস অংশত মিসরের প্রথম প্রেসিডেন্ট নাসেরের মধ্যে নিজেকে দেখতে পান। ফারাও আখেনাতেন বিতর্কে অংশ নিয়ে সাদাতকে তাঁর মতোই শান্তির সন্ধানী বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন যে তাঁদের দুজনকেই অন্যায়ভাবে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নিন্দিত হতে হয়েছে। কিন্তু কে এই আখেনাতেন? এ প্রশ্নটি নাগিব মাহফুজের কাছে সবচেয়ে অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে বলে মনে হয়।

এরপর নাগিব মাহফুজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস 'আল-আইশ ফি-ল-হাকিকা' প্রকাশিত হয়, যার ইংরেজি অনুবাদ 'ডুয়েলার ইন ট্রুথ'। বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি একাধিক চরিত্রকে তাঁর কাহিনির বিবরণীতে তাঁর সুপরিচিত হেঁয়ালি প্রয়োগ করে আখেনাতেনের পরিচিতি তুলে ধরেন, যিনি সূর্যের প্রতি নিবেদিত চমৎকার প্রার্থনাসংগীতের রচয়িতা ও তুতেনখামুনের পূর্বসূরি। রাজা চতুর্থ আমেনোফিস, যিনি খ্রিষ্টপূর্ব ১৩৭৫ থেকে ১৩৫৮ সাল পর্যন্ত মিসরের শাসক ছিলেন, তিনি বংশপরম্পরায় পূজিত আমুন ও থেবসের অন্যান্য দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন পরিত্যাগ করে রাজধানী ছেড়ে 'তেল এল-আমারনা' নামক এক স্থানে চলে যান নতুন রাজধানী স্থাপনের উদ্দেশ্যে। তিনি তার সকল পূজা-অর্চনা নিবেদন করেন আতেনের সূর্য দেবতার প্রতি, যার হাতে ধরা থাকে সূর্যের প্রতীক, যেখান থেকে বিচ্ছুরিত হতে থাকে সূর্যরশ্মি, যা বিবেচিত হয় জীবনের শক্তি হিসেবে। একইভাবে নির্মিত হয় সূর্যরশ্মির প্রতিনিধিত্বকারী মিসরের বিখ্যাত স্তম্ভ। আতেন প্রাচীন সূর্য দেবতা 'রা'র একটি অবয়ব, যিনি সর্বশক্তিমান এবং সর্বজনীন ঈশ্বর। রাজা স্বয়ং তার পরিবর্তন করেন 'আখেনাতেন' হিসেবে, যিনি আতেনের জন্য উপকারী এবং তিনি তার নতুন নগরীর নামকরণ করেন 'আখেত-আতেন' বা 'আতেনের দিগন্ত'। তার রাজত্বকালে তার বিপ্লবী ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংস্কারের ফলে মিসর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ক্ষমতা থেকে উৎখাত হন। তার উত্তরাধিকারী তুতেনখামুন তার পূর্বসূরি আখেনাতেনের সকল সংস্কার বাতিল করেন এবং রাজধানী পুনরায় নিয়ে যান থেবসে। আখেত-আতেন নগরী পরিত্যক্ত ও ধ্বংস হয়ে যায়।

ইতিহাসের এই পর্যায়ে নাগিব মাহফুজের উপন্যাস শুরু হয়েছে। আখেনাতেনের পতনের কিছুকাল পর উপন্যাসের মূল চরিত্র মেরিয়ামুন ও তার পিতা ভয়াবহ বন্যার সময় তাদের সাঈসের প্রাসাদ ছেড়ে নীল নদ ধরে নতুন অভিযাত্রা শুরু করেন। (মেরিয়ামুনের মমি কায়রোর জাদুঘরে এখনো রক্ষিত আছে)। তারা এক অদ্ভুত নগরী অতিক্রমকালে লক্ষ করেন যে নগরীর রাস্তা জনশূন্য, গাছগুলোতে কোনো পাতা নেই এবং বাড়িঘরের দরজা ও জানালাগুলো মৃত মানুষের চোখের পাতার মতো বন্ধ। সম্পূর্ণ নীরব-নিস্তব্ধ এক নগরী। পিতার নিকট থেকে তিনি জানতে পারেন যে এটি ধর্মদ্রোহী ও ধর্মের প্রতি আস্থাবিহীন এক ফারাওয়ের। নগরীটি তখনো সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত নয়। ফারাওয়ের সাবেক রানি তখনো সেখানে বাস করছেন, যার নাম রানি নেফারতিতি, যিনি মিসরের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা হিসেবে বিবেচিত, শূন্য নগরীতে তিনি একা বসবাস করছেন। অনেকটা কারাগারে বাস করার মতো। নেফারতিতি নামের অর্থ 'সুন্দরীর আগমন ঘটেছে'। মেরিয়ামুনের তখন মনে পড়ে যে ঘূর্ণিতে নগরী ধ্বংস হয়েছে, সে সম্পর্কে তিনি শুনেছেন। সে যুগকে বলা হয় দেবতাদের যুদ্ধের যুগ। তরুণ ফারাও-সম্পর্কিত কাহিনিও তিনি শুনেছেন, যিনি তার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং পুরোহিত ও নিজের ভাগ্যকেও চ্যালেঞ্জ করেন। মেরিয়ামুনের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি হয় এই অদ্ভুত ফারাও ও তার সম্পর্কে সত্য উদ্‌ঘাটনের। তার পিতাও এতে সম্মতি দেন, যিনি নিজেও সত্যসন্ধানী ছিলেন। কিন্তু

পিতার লক্ষ্যের সাথে তার মিল ছিল না। মেরিয়ামুন শুধু সত্যসন্ধানের মধ্যে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি বরং জ্ঞান আহরণে অধিক মনোযোগী ছিলেন এবং নিজের মতো করে সবকিছু জানতে ব্রতী ছিলেন। তিনি আধুনিক একজন অনুসন্ধানী বিজ্ঞানমনস্ক গবেষকের মতো কাজ শুরু করেন। সম্ভবত এটি নাগিব মাহফুজের উপন্যাস রচনার নির্দেশনা হিসেবে কাজ করেছে। মেরিয়ামুন যেভাবে আখেনাতুন সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন, একইভাবে আমরাও উপন্যাসের মেরিয়ামুন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠি।

মেরিয়ামুন থেবসে গিয়ে যারা ফারাও আখেনাতুন সম্পর্কে জানে, তাদের সাথে এবং পরিত্যক্ত নগরীতে নেফারতিতির সাথেও সাক্ষাৎ করেন। এভাবে উপন্যাসে ১৪টি কাহিনি বর্ণিত হয়েছে এবং সত্যের নানা ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। তিনি আখেনাতুনের প্রধান পুরোহিত মেরি-রার সাক্ষাৎকার নেন এবং এরপর দেখা যায় মেরিয়ামুন স্বয়ং পুনঃস্থাপিত দেবতা আমুনের নাম ধারণ করেছেন। তিনি রাজমাতা তাইয়ের কাছে তার পুত্র সম্পর্কে জানতে চান, তার সচিব, প্রধান কোতোয়াল, নেফারতিতির পিতা এবং আরো অনেককে প্রশ্ন করেন। উপসংহারে দেখা যায়, আসলে আখেনাতুনের চরিত্র, তার শাসন ও যুগ সম্পর্কে সত্য স্থির করাটা নির্ভর করে পুরোপুরি পাঠকের ওপর। এর বাইরে সত্য আখেনাতুন নামের ব্যক্তি এবং আতেন নামের দেবতার মতোই সম্পূর্ণ অস্পষ্ট ও অদৃশ্য।

সর্বশেষ সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় রানি নেফারতিতির। তিনি জানান যে তার সাবেক স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি অপেক্ষা করে আছেন তার প্রিয় স্বামীর সাথে পরবর্তী জীবনে সাক্ষাৎ হবে। চিরদিনের মতো তার সাথে মিলিত হওয়ার এবং স্বামীর সত্যের সিংহাসনের পাশে উপবেশনের আশাও করছেন। আখেনাতুন সে হিসেবে সিংহাসনের সামনে প্রধান বিচারপতি ওসিরিসের মতো। মেরিয়ামুন এভাবে দেখতে পান, এ পৃথিবীতে সত্যের পথের সূচনা ও শেষ নেই, বিশেষ করে যারা চিরন্তন সত্যের সন্ধানে ছিলেন, তারা এর বিস্তার ঘটিয়েছেন। একইভাবে ইতিহাসও কোনো সূচনা ও সমাপ্তিহীন। মেরিয়ামুন অবশেষে তার অনুসন্ধান এবং বিভিন্ন ব্যক্তি তাকে যা বলেছেন, সে সম্পর্কে সকলকে জানান। কিন্তু তিনি শুধু দুটি বিষয় পাঠককে জানিয়েছেন : এক এবং একমাত্র ঈশ্বরের বন্দনাশ্লোকের প্রতি তার ক্রমবর্ধমান অনুরাগ এবং সুন্দরী নেফারতিতির জন্য তার ভালোবাসা। উপন্যাসটিতে সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পাঠকেরা সাহিত্য ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি তার শ্রদ্ধা সম্পর্কে একটি উপসংহারে উপনীত হতে পারেন যে এক এটি আল্লাহ হতে পারে বা সমগ্র মানবতার বা একজনমাত্র ব্যক্তির সত্য হতে পারে। আতেন ও আখেনাতেনের রহস্য ঘিরে সবকিছু আবর্তিত হয়েছে। বিচারক ওসিরিস, আইসিস ও হোরাসের মতো মাহফুজ মিসরের শাসনব্যবস্থা, জীবন ও আচার-আচরণের মান নিরীক্ষা ও মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। তাঁর অনুসন্ধান পরিসমাপ্তিবিহীন এক উদ্যোগ।

কায়রো ট্রিলজি

'দ্য কায়রো ট্রিলজি' নাগিব মাহফুজের সেরা সাহিত্যকর্ম হিসেবে বিবেচিত, যাতে কায়রোর শহুরে জীবনের বিবরণ সবিস্তার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই বিশাল কাজটি সম্পন্ন করতে ছয় বছরের অধিক সময় লেগেছে। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত। মিসরের পুরোনো শাসকগোষ্ঠীর চূড়ান্ত পতন এবং গ্রন্থটির রচনার পরিসমাপ্তির একটি সম্পর্ক রয়েছে। এটি রচনা করতে তিনি জন গলসওয়ার্দির 'দ্য ফোর্সাইট সাগা' ও টমাস মানের 'বাডেনব্রুকস' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়। আধুনিক আরবি সাহিত্যে 'দ্য কায়রো ট্রিলজি' প্রথম পারিবারিক কাহিনি। অনেকেই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চেষ্টা করলেও এটির ব্যাপকতা ছাড়িয়ে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। মাহফুজ ব্যক্তিগত রাজনৈতিক জটিলতার মধ্যে ছিলেন; কারণ, ১৯৪২ সালে তাঁর পছন্দের রাজনৈতিক দল ওয়াফদ পার্টি ব্রিটিশের অনুরোধে সরকার গঠন করতে সম্মত হওয়ায় তিনি পুরোনো ওয়াফদ পার্টির আদর্শের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন অথবা সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করেছিলেন। অতএব, ট্রিলজি তাঁর নিজস্ব দিকনির্দেশনার অনুসন্ধান এবং ব্যক্তিগত চেতনা ও ইতিহাস তুলে ধরার প্রচেষ্টার প্রতিফলন। এটি আধুনিক মিসরের রাজনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের বর্ণনামূলক রেকর্ড, যেখানে জাতীয় পরিচিতি এবং আধুনিক বিশ্বে মিসরের অবস্থান খোঁজা হয়েছে। এ ছাড়া এতে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দৃশ্য সুনিপুণভাবে অঙ্কন করার পাশাপাশি মানুষের সম্পর্কের সকল দিক উঠিয়ে আনার চেষ্টাও লক্ষণীয়। সামাজিক ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের মূল্যবান দলিল ছাড়াও 'দ্য কায়রো ট্রিলজি'র সাহিত্যমান অনন্যসাধারণ।

'দ্য কায়রো ট্রিলজি' তিনটি পৃথক খণ্ডে বিভক্ত হলেও নাগিব মাহফুজের উদ্দেশ্য ছিল একটি গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ করা। এটির রচনা শেষ হলে তিনি ফুলস্কেপ কাগজে এক হাজার পৃষ্ঠার অধিক আকৃতির পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে তাঁর প্রকাশক সাঈদ আল-শাহারের কাছে যান। তিনি পাণ্ডুলিপি না পড়েই শুধু এর আকৃতি দেখে মন্তব্য করেন, 'এটি কোন ধরনের দুর্যোগ?' বিশাল উপন্যাস প্রকাশের বিপুল ব্যয়ের কথা বিবেচনা করে তিনি মাহফুজকে পাণ্ডুলিপি ফেরত দেন, যদিও আরবি সাহিত্যের দিকপাল তাহা হোসেন উপন্যাসটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। প্রকাশকের আচরণে নাগিব মাহফুজ মনঃক্ষুণ্ন হন এবং ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা হয় তাঁর। এ অবস্থা থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন নতুন সরকারের সাহিত্যবিষয়ক অধিকর্তা ইউসুফ আল-সিবাই। তিনি 'আল রিসালাহ আল-জাদিদাহ' নামে একটি মাসিক সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের জন্য একটি ভালো উপন্যাস খুঁজছিলেন। তিনি নাগিব মাহফুজের কাছে জানতে চান যে তাঁর নতুন কোনো পাণ্ডুলিপি আছে কি না। মাহফুজ তাঁকে প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানানো উপন্যাসটি সম্পর্কে জানালে আল-সিবাই গ্রন্থের দৈর্ঘ্যের কারণে হতাশ না